শিক্ষা ও সংস্কৃতি – বাঙালি মুসলিম পরিচিতির মূল

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী

অধ্যক্ষ,

শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়,

উত্তর ২৪ পরগনা।

শিক্ষা হল বাস্তব জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ। একজন মানুষ যে কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারে না, যার কোনো কাজের প্রশিক্ষণ নেই - সে মানুষের কাজে লাগে না – সমাজের উপরে বোঝা। যেমন, একটা ভাড়ি লোহার খণ্ডকে উপযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা মোটরগাড়ি তৈরি করা যেতে পারে, যেটা মানুষের যাতায়াতের সুবিধা করবে। কিন্তু, তা না করে লোহার খণ্ডটিকে পায়ে বেঁধে বা মাথায় নিয়ে চলতে চেষ্টা করলে গতি, প্রগতি রোধ হবে। সেইরূপ, শিক্ষিত ব্যক্তি হল সম্পদ, যা সমাজের উপকারে লাগে। সুতরাং, শিক্ষাহীন মানুষ শুধু নিজের প্রয়োজন মিটাতে পারে না - এমন নয়, সে অন্যের ও সমাজের উপরে বোঝা।

বাঙালি মুসলিমরা মূলতঃ হিন্দু ধর্মের জাত-ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর শুদ্র ও অতি-শুদ্র (দাসত্বের জাত-স্তর) থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তাই, তারা ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত – শুধু শিক্ষাতেই নয়, বরং জীবন-ধারনের উপকরনের সকল ক্ষেত্রেই। এই দীর্ঘ দাসত্বের কারণে তারা এমনকি ভালোভাবে বাঁচার তাগিদও হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ, প্রধানত সুফি সাধকদের প্রভাবে বাঙলার তথা পূর্ব ভারতের শ্রমজীবি গরিব মানুষেরা ইসলাম গ্রহন করেছিলেন। কিন্তু সুফি ধর্মগুরু তাদেরকে ইসলামের কলেমা পড়িয়ে যখন এক জায়গা থেকে ডেড়া তুলে অন্য জায়গায় চলে গেলেন, কলেমা পড়া নব মুসলিমরা যেখানকার ছিলেন সেখানেই থেকে গেলেন! অর্থাৎ, ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হল কিন্তু কোনো ক্লাস হল না, পাঠ্যক্রম বুঝলো না! এরূপ ছাত্ররা পরীক্ষায় ব্যর্থ হবেই। এই নব মুসলিমরা কলেমা তো পড়লেন কিন্তু ইসলাম বুঝলেন না। তাই, পরীক্ষায় ফেল করছেন। বাস্তব জীবনের সকল দিকে আজ বাঙালি মুসলিমরা ব্যর্থ। দু'টি ঐতিহাসিক কারণে বাঙালি মুসলিমদের সমস্যা আরও জটিলতর হয়েছে – (১) বাঙলার উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠা মুসলিম বিরোধী ঔপনিবেশিক শাসন, (২) বাঙলা বিভাজন। প্রথম কারণটির জন্য বিশেষত বাঙালি মুসলিমরা বৃটিশদের কাছে নিজেদের রাজ-পাঠ খুঁইয়েছেন এবং ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ একশত বছর দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে অসমতার লড়াই লড়েছেন। এছাড়াও প্রতিকূলতার মাত্রাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল কিছু ঘরের শত্রু বিভিষণেরা। বৃটিশদেরকে বিদেশী শত্রু মনে করায় তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইংরেজী ভাষাকে মুসলিমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাক্ষাণ করেছিলেন। কিন্তু অন্য সম্প্রদায় বৃটিশদের সঙ্গে যেমন সখ্যতা রেখেছিলেন তেমনি প্রথম সুযোগেই তারা রাজানুকূল্যের ভাষা – ইংরেজি শিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, দেশের দুটি প্রধাণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলিমরা দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় শতবছর আগে থেকেই

আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত দিকে অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছিলেন। - এই অবস্থায় বৃটিশদের হাত থেকে দেশের শাসনক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত হলে দেশের অগ্রবর্তী অংশ উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা ক্ষমতার সিংহভাগ লাভবান হন। ছিটেফোঁটা কিছু মুসলিম ভারতীয় ও বাঙালি মুসলিম অগ্রবর্তী নেতৃত্বের জায়গায় ছিলেন বটে কিন্তু ক্ষমতার হস্তান্তরের অভিশাপ, দেশ খণ্ডিতকরণের ফলে তাঁরা দেশের বাইরে, ঐপারে পরে থেকে যান বা চলে যান। ফলে ১৯৪৭-এর পরে ভারতে ও বাঙলায় থেকে যাওয়া মুসলিমরা সম্পূর্ণ অনাথ, নেতৃত্বহীন হয়ে পরেন। অপর দিকে অন্য অগ্রবর্তী সম্প্রদায়ের সকল নেতৃত্ব তো এদেশে ছিলেনই, উপরন্তু দেশের ঐপার থেকে তাদের বিচক্ষণ নেতৃত্ব আরও এদেশে আসেন। প্রথম থেকেই মুসলিমরা অশিক্ষা, দারিদ্রতা ও অজ্ঞতার শিকার ছিল। এখন নেতৃত্বহীনতা তাঁদেরকে রাখালবালকহীন ভেড়ার পালে পরিণত করে ছাড়ল! অন্য সম্প্রদায়ের বিচক্ষণ নেতৃত্ব মুসলিমদের এই অসহায় পরিস্থিতর সুযোগ নিয়েছেন। তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করেন নি, বরং নেতাদের প্রতি মুসলিমদের নির্ভরতা পূর্ণ করেছেন। মানুষের প্রকৃত উন্নতির সোপান, শিক্ষা ও চাকরির বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে মুলিম সমাজকে অবনতির গহ্বরে প্রথিত করে তাদেরকে নেতাদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ সাধনের হাতিয়ার – রাজনৈতিক লেঠেলবাহিনী, ভোটদানের যন্ত্র এবং ভোটশিকারের চারা হিসাবে ব্যবহার করে চলেছেন মাত্র। সুতরাং, দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরের অব্যবহিত পরেই বাঙালি মুসলিমদের অবস্থা ছিল – শিক্ষাসহ সকলদিকে পিছিয়ে পরা, বঞ্চিত, শিক্ষাহীন-কিংকর্তব্যবিমূঢ়, পরিচিতিহীন এক সম্প্রদায়।

বৃটিশরা চলে যাওয়ার পরে, ঔপনিবেশিকোত্তর 'স্বাধীন' ভারতে বাঙালি মুসলিমসহ সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা সেই অর্থে অন্যসম্প্রদায়টির মতো সমান স্বাধীন হলেন না! বিশেষ করে বাঙালি মুসলিমরা অন্য সম্প্রদায়ের নেতাদের কাছে বৈষম্যের স্বীকার হলেন। সাম্প্রতিক খোদ সরকারি প্রতিবেদনগুলিই এর প্রমাণ! এর কারণ দু'টি – প্রথমতঃ ব্যতিক্রম ছাড়া, উচ্চবর্ণীয় শাসকদের সমাজ ব্যবস্থার গভীরে প্রথিত মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচু বিভেদের জাত ব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত তাদের মনোভাব । এই মনোভাব 'ম্লেচ্ছ' মুসলিমদের প্রতি মোটেই অনুকূল নয়। দ্বিতীয় কারণটি হল – মুসলিমদের মধ্যে নেতৃত্বহীনতার ধারাবাহিকতা। এই অবস্থা মুসলিমদেরকে আইনসভাসহ সমাজ ও দেশ পরিচালনার শক্তিকেন্দ্রগুলিতে সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বহীন, অচেতন, আত্মজ্ঞানীন, দরিদ্র ও বিভ্রান্ত এক সম্প্রদায়ে পরিণত করেছে। অপরদিকে উর্দুভাষী মুসলিমরা বাঙলা খণ্ডিতকরণের ফলে ততটা ক্ষতিগ্রস্থ হন নি, যতটা বাঙলাভাষী মুসলিমরা হয়েছেন। তাই, ভারতে বাঙলি মুসলিমদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়!

গত প্রায় তিন-চার দশক আগে শুরু হওয়া আল আমিন মিশনের শিক্ষা আন্দোলন এখন বাংলা ব্যাপি মুসলিম জীবনে এক বনজাগরনের সঞ্চার করেছে। বাঙালি মুসলিমরা এখন শিক্ষিত হওয়ার, অজ্ঞতাজনিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠার এবং সম্মান ও পরিচিতি খোজার চেষ্টা করছেন।

একজন মানুষ সাধারণভাবে যে কাজগুলি করেন, সেগুলিই হল তার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। শিক্ষা আত্মসচেতন করে; অর্থাৎ, ব্যক্তিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। আর সংস্কৃতি সেই নতুন, সচেতন, আলোকিত ব্যক্তিকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, সংস্কৃতি ব্যক্তি, সমাজ বা গোষ্ঠীকে দৃঢ় বাঁধন দেয়, ভিত দেয় বা মানব সভ্যতার মাটির গভীরে মজবুত মূল প্রদান করে। যে বৃক্ষের মূল মাটির গভীরে যতটা বেশি প্রথিত, ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সে বৃক্ষ ততটাই বেশি সফল। আর যে গাছের মূল মাটির ভিতরে প্রথিত নয়, আলগাভাবে কেবল উপরেই দৃশ্যমান, সেটাকে একটা শিশুও ঠেলা দিয়ে ফেলে দিতে পারে। একইভাবে, কোনো মানবজাতি বা সম্প্রদায়ের স্থায়িত্ব ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা তার স্বকীয় ও মজবুত সংস্কৃতির বাঁধনের উপরে নির্ভর করে। যে সমাজ বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব দৃঢ় সংস্কৃতি নেই – তার অবস্থা কচুরিপনার মতো; হাওয়ার দোলায় ডোবার এপার থেকে ওপার হতে থাকে – নিজস্ব নির্ভরযোগ্য কোনো অবস্থান নেই। কচুরিপনার নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত নেই, বাইরের প্রভাবক হাওয়ার ইচ্ছাতেই তার অবস্থান, তার পরিচিতি – যেটা ঘন ঘন পরিবর্তনশীল! সুতরাং, নিজস্ব মজবুত সংস্কৃতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা সমাজের নিজস্ব পরিচিতি হতে পারে না, সমাজে তার নির্ভরযোগ্য অবস্থানও হতে পারে না। আর যে নির্ভরযোগ্য নয়, সে সম্মানের পাত্রও নয়। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বা সমাজ সফলতা পেতে পারে না। - বাঙালি মুসলিম সমাজ এরূপ অবস্থাতেই রয়েছেন। শিক্ষা তথা সম্পূর্ণ শিক্ষার অভাবে তাঁরা নিজস্ব সর্বোত্তম সংস্কৃতি সম্বন্ধে অচেতন /উদাসীন! তাই, হীনমণ্যতায় ভুগছেন, নিজস্ব সংস্কৃতি-পরিচিতি-আত্মসম্মানবোধের সঙ্গে সমঝোতা করছেন। ফলে তার মূল আলগা হচ্ছে, সমাজে বাঁধন শিথিল হচ্ছে – সম্মান ও সফলতা হাতছাড়া হচ্ছে!

পরিচিতি দু'টো বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে – শিক্ষা ও সংস্কৃতি। পরিচিতি যত ভালো হবে, সমাজে ততটাই সম্মানিত স্থান পাওয়া যাবে। তাই, অফিসে আগন্তুক ব্যক্তিটির সঙ্গে ব্যবহার তাঁর পরিচিতি /পদমর্যাদা অনুসারে অফিসাররা করে থাকেন। উপযুক্ত শিক্ষা ও নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার অভাবে বর্তমানে বাঙালি মুসলিমদের পরিচিতি খুব একটা ভালো নয়। তাই, আমাদেরকে শিক্ষায় ও প্রাকৃতিক ইসলামিক সংস্কৃতি চর্চায় গুরুত্বারোপ করতে হবে। প্রাকৃতিক ইসলামিক সংস্কৃতি বলতে চলতি শতবিকৃতিময় মুসলমানদের সংস্কৃতির বদলে নবী (সা.) প্রদর্শিত বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল, প্রকৃতি নির্ভর ইসলামিক সংস্কৃতি বোঝায়। কারণ, ভেজাল যুক্ত জিনিস কোনো সময়ই কল্যাণকর, স্বাস্থ্যকর নয় – সংস্কৃতিও তাই। এই সম্মাণীয় পরিচিতি তৈরিতে শিক্ষাখাতে যে অর্থ বরাদ্দ দরকার – গরিব হলেও, তা করার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের রয়েছে। মুসলিম সমাজের সামগ্রিক আয় যে কোনো সমাজের চেয়ে বেশি। জাকাত, কুরবানি, ফিতরা, সদকা, দান ... ইত্যাদি খাতের আয়গুলো শিক্ষালাভের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে একরকম দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তিদানের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রাকৃতিক ইসলামিক সংস্কৃতির বাঁধন দ্বারা সমাজে সম্মাণীয় পরিচিতি পুণঃপ্রতিষ্ঠা করতে না পারলে শিকরহীন গাছের মতোই বাঙালি মুসলিমদের

অবস্থা হয়েছে ও হবে। ইমলামিক সংস্কৃতি যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (সা.) দ্বারা এই গ্রহের মানুষদের জন্য প্রবর্তিত – তাই, এই সংস্কৃতি পৃথিবীর পরিবেশ প্রকৃতির সঙ্গে মানানসয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে বাধ্য। হোমোস্যাপিয়ান নামে একই মানব প্রজাতি যেমন নিজের মৌলিক বৈশিষ্টকে অপরিবর্তিত রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে সহজেই অভিযোজিত বা মানাসয় হয়েছে, তেমনি ঈশ্বরের সংস্কৃতি ইসলাম এবং তার ধারক ও বাহক মুসলমানরা তার /তঁদের মূল বৈশিষ্টকে অপরিবর্তিত রেখে বাঙলা সহ পৃথিবীর সকল অংশের প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে অবশ্যই সম্মানজনকভাবে অভিযোজিত বা মানাসয় হতে পারবেন। কিন্তু সমস্যা হয়েছে আল্লাহর ইসলাম প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে নমনীয় হলেও, বর্তমান মুসলমানদের, বিশেষ করে বাঙালিসহ ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারা আচরিত ইসলাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই কাম্য নমনীয়তা বিবর্জিত ও মনগড়া বিদআত (বিকৃতি)–এর দরুন সংকীর্ণতাজনিত যুক্তিহীন দৃঢ়তায় অবরুদ্ধ! উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম সমাজে প্রচলিত স্ত্রীতালাক দেওয়ার পদ্ধতি, ইংরেজি /বাঙলা শিক্ষার বিরুদ্ধে আগে ফতোওয়া জারি, ইসলামে রাজনীতি নেই বলে ফতোওয়া, স্কুল-কলেজে মহিলা শিক্ষার বিরুদ্ধে মুসলিমদের দীর্ঘদিনের অবস্থান, মধ্যরাত্রে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে পাড়া-প্রতিবেশির ঘুম ভাঙিয়ে বিরাগভাজন হওয়া, ইত্যাদি কর্মকাণ্ডগুলো আল্লাহর পবিত্র কোরআন ও নবী (সা.) প্রদর্শিত ইসলামের পরিপন্থি হলেও বহাল তবিয়েতে চলেছে /চলছে!

এই সংকটজনক অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের মহান সমাজবিদ, ড. আম্বেদকারের একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক, *"শিক্ষিত কর, আন্দোলিত কর, সংগঠিত কর"*। এই কাজে এদেশের নির্যাতিত এস.সি.-এস.টি.-ও.বি.সি. বৃহৎ সমাজের সঙ্গে সামাজিক সমন্বয় (Social Synthesis)-এর কাজে গুরুত্বারোপ করতে হবে। ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলিমদের সীমাবদ্ধ সহায়-সম্পদ ও মূল্যবান সময়, বিশ্বজনীন ইসলামি খিলাফৎ-এর দিবাস্বপ্নে বা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার একমাত্র সংরক্ষক-সৈনিক/ বলির পাঠা হয়ে ধ্বংস না করে নিজেদের শিক্ষা-কর্মদক্ষতা-সংস্কৃতির উৎকর্ষতায় নিয়োগ করা দরকার। কারণ, বর্তমান বিশ্ব জাতিয়তাবাদের, আন্তর্জাতিকতাবাদের জায়গা এখানে প্রায় নেই। আর গণতান্ত্রিক ভারতের শাসন চরিত্র নির্ধারণ করার দায়িত্ব বা সাধ্য সংখ্যালঘুদের নয় সংখ্যাগুরুদের। আমাদের প্রয়োজন উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদেরকে আগে সমাজের সম্পদের পরিণত করা। তার পরে, নিজেদের সঙ্গে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০-৯০ শতাংশ নির্যাতিত সমাজকে সামাজিক সমন্বয়ের মাধ্যমে, সকলের সাংবিধানিক ও পূর্বপুরুষদের নাগরিক উত্তরাধিকারের দাবিতে শিক্ষিত, আন্দোলিত ও সংগঠিত করা। উন্নত, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও মজবুত সংস্কৃতির বাঁধনই এই কাজের পুঁজি। আনুবিক্ষণীক তিন শতাংশ ইহুদী আজ এই পুঁজিকে বিনিয়োগ করে পৃথিবীর চালিকাশক্তি হতে পেরেছে, আমরা চোদ্দ শতাংশ মুসলিম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্যাতিত মানুষও মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবো। আমিন।